بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, মোতাবেক ০৯ তবলীগ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আয়েশা (রা.)-কর্তৃক একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, **'যদি প্রয়াত কোন ব্যক্তির জানাযা ১০০ জন মুসলমান পড়ে আর তারা সবাই তার ক্ষমার সুপারিশ করে, তাহলে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।'** (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নং: ২১৯৮)

এছাড়া আরো একটি হাদীস রয়েছে: **'এক ব্যক্তির মৃরদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ যখন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন মহানবী (সা.) বলেন, জান্নাত তার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে।'** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নং: ১৩৬৭)

হুযূর (আই.) বলেন, আমি যেহেতু আজকে দুই ব্যক্তির জানাযা পড়াব তাই আমার ইচ্ছা ছিল, জানাযা আর দাফন-কাফন সংক্রান্ত আরো কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্বৃতি ও ফিকাহ্শাস্ত্র হতে এ সম্পর্কিত কিছু কথাও বর্ণনা করি সেই সাথে প্রয়াতদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু কথাও শোনাব; কিন্তু আজ, এই বিষয় সংক্রান্ত হাদীস এবং উদ্বৃতি সমূহ শোনানো সম্ভব হচ্ছে না। কেননা জামা'তের কর্মী (অর্থাৎ খাদেম) এবং বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াক্ফের প্রতি সুবিচারকারী আর খিলাফতের আনুগত্যকারী যেই ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই অধিকন্তু যার গায়েবানা জানাযাও এখন পড়াব, তার সম্পর্কে মানুষের পাঠানো এত বেশি তথ্য একত্রিত হয়েছে যে কেবল তাই বর্ণনা করাই কঠিন হবে। এর মধ্য থেকেও আমি হয়ত এক পঞ্চমাংশ নিয়ে এসেছি আর যা নিয়ে এসেছি তা-ও হয়ত পুরো শোনাতে পারব না। এসব ঘটনা স্বীয় বৈশিষ্ট্যে একজন জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির জন্য, একইভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশধরদের জন্য ও পদধারীদের জন্য, অনুরূপভাবে জামা'তের সদস্যদের জন্যও বিভিন্নভাবে পথের দিশারী ও অনুকরণীয় বিষয়।

যেমনটি আপনারা জানেন, সম্প্রতি হযরত সাহেবযাদা মির্যা আযীয আহমদ সাহেব (রা.)-এর পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। অবশ্য দীর্ঘদিন থেকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন; আকস্মিক কার্ডিয়াক এরেস্ট হয় বা হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যায়, যার ফলে নিজ আবাসগৃহেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

শ্রদ্ধেয় মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সবচেয়ে বড় পুত্র মির্যা সুলতান সাহেবের পৌত্র আর হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব (রা.)-এর সুপুত্র ও হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। একইসাথে তিনি আমার ভগ্নিপতিও ছিলেন। তার মাতা সাহেবযাদী নাসিরা বেগম সাহেবা হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)-এর সবচেয়ে বড় দুহিতা ছিলেন। এই সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্ব-অবস্থানে ততটা উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। সত্যিকার অর্থে এসব আত্মীয়তার সম্পর্ককে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য করে তোলে তা হলো, তার গুণাবলী যা আমি বর্ণনা করব। তিনি জামা'তের একজন খাদেম বা সেবক ছিলেন। ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে শারীরিক দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও আর বড় ভাইয়ের ইন্তেকালে যে প্রভাব পড়েছে তা সত্ত্বেও আমি যখন তাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করি, তিনি সব দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেন। রীতিমত অফিসে আসতেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন। মৃত্যুর একদিন পূর্বে মাদ্রাসাতুল হিফযের অনুষ্ঠান ছিল, যারা সফলভাবে কুরআন হিফয বা মুখস্থ করেছে তাদের মাঝে সনদ বিতরণ করার ছিল, এতে যোগদান করেন। সন্ধ্যাবেলা খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মৃত্যুর দিন সকালেও অনেকের বাসায় যান, রোগীদের দেখতে যান। একইভাবে পাঁচ বেলার নামায মসজিদে মোবারকে গিয়ে পড়েন। জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে তার জীবনের সূচনা ১৯৬২ সনের মে মাসে হয়েছে। তিনি লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ করেছেন। এরপর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তথা সিসিএস পরীক্ষা দিয়েছেন। তাতে সফলকাম হন এবং উত্তম সাফল্য লাভ করেন। তিনি স্বয়ং আমাকে বলেছেন, আমার এ পরীক্ষা দেয়ার কারণ হলো, মানুষ বলত, খুবই কঠিন পরীক্ষা, পাশ করার জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। এছাড়া কেউ যেন এ কথা বলতে না পারে যে, অন্যত্র কোন জায়গা হয় নি তাই এখানে এসেছে! সুতরাং জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সাফল্য লাভের পর আমি জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছি। এই সাফল্য সত্ত্বেও সরকারী চাকরি করেন নি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যান নি বরং জীবন উৎসর্গ করেন। আমি যেমনটি বলেছি, ১৯৬২ সনে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রাবওয়ার রিভিউ অফ রিলিজিওন্স পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে এ কথাও বলেন, জাগতিক শিক্ষা যা তুমি অর্জন করেছ, এর পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন কর। অতএব তিনি হযরত সৈয়দ মীর দাঊদ আহমদ সাহেবের কাছে হাদীস এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন। হযরত মীর দাঊদ আহমদ সাহেব রিভিউ অফ রিলিজিওন্স এর সম্পাদক ছিলেন আর সম্পর্কে তার মামাও ছিলেন। তার (অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের) প্রথম নাম ছিল মির্যা সাঈদ আহমদ। পরবর্তীতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার মায়ের অনুরোধে তার নাম রাখেন মির্যা আহমদ। তিনি সীরাতুল মাহদীতে কোন ঘটনা পড়েছিলেন। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তার ধারণা হয় যে, নাম মির্যা সাঈদ আহমদ রাখা ঠিক হবে না। মির্যা সাঈদ আহমদ তার বৈমাত্রেয় ভাই

ছিলেন যিনি যৌবনেই ইন্তেকাল করেন। তিনি এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে পড়াশোনাও করেছেন। মির্যা মুজাফ্ফর আহমদ সাহেব প্রমুখদের তিনি সহপাঠি ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে একইসাথে তিনি (অর্থাৎ মরহুমের মা) একথাও বলেন যে, নাম পরিবর্তন করা হলে হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব দুঃখ ভারাক্রান্ত হবেন, অতএব তারও যেন মন রক্ষা হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তাহলে আমরা এমন নাম রাখব যার ফলে তার পিতারও কোন কষ্ট হবে না। আর এরপর তিনি (রা.) মির্যা গোলাম আহমদ নাম রাখেন। কিন্তু একইসাথে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একথাও বলেন যে, আমরা তাকে আহমদ বলে ডাকব কেননা; হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর এখনও খুব বেশি একটা সময় কাটে নি। আর আমার জন্য তাকে গোলাম আহমদ বলে ডাকা খুবই দুরূহ কাজ হবে। ১৯৬৪ সনে আমার বোনের সাথে তার বিয়ে হয়। মৌলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব বিয়ে পড়িয়েছেন। খলীফা সানী (রা.) তখন অসুস্থ ছিলেন। তার তিন পুত্র এবং দু'জন কন্যা সন্তান রয়েছে। দুই পুত্র ওয়াক্ফে যিন্দেগী। মির্যা ফযল আহমদ সাহেব নাযের তালীম রাবওয়ায়, আর মির্যা নাসের ইনাম এখানে তথা যুক্তরাজ্যে জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল। মির্যা এহসান আহমদ সাহেব আমেরিকায় বসবাস করেন। তিনি যদিও জাগতিক আয়-উপার্জন করেন কিন্তু সেখানেও জামা'তের কাজ করছেন। ন্যাশনাল মজলিসে আমেলায় তিনি সেক্রেটারী মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; একইভাবে 'জলসাগাহ্' এর অফিসারও বটে। তার দু'কন্যার একজন হলেন, আমাতুল ওলী যুবদা আর দ্বিতীয় জন হলেন, আমাতুল আলী যাহরা যিনি মীর মাসুদ আহমদ সাহেবের পুত্র মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের সহধর্মীণি। তিনিও জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বর্তমানে নাযের সেহেত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের অবদানের মাঝে একটি হল, তিনি নাযের তা'লীম হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন। বেশ কয়েক বছর এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ইরশাদ মোকামী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নাযের দেওয়ান হিসেবে কাজ করেছেন বরং যতদিন নাযেরে আলা নিযুক্ত করা হয় নি ততদিন তিনি নাযের দেওয়ান ছিলেন অর্থাৎ, ১৯৯৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত। এরপর ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সদর মজলিস কারপরদায হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি তাকে নাযেরে আলা ও আমীরে মোকামী এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত করি। ইতিপূর্বেও চতুর্থ খিলাফতের সময় তিনি বেশ কয়েকবার ভারপ্রাপ্ত নাযেরে আলা এবং ভারপ্রাপ্ত আমীরে মোকামী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। একইভাবে মজলিসে ওয়াকফে জাদীদেরও কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ওয়াকফে জাদীদের সদর ছিলেন। আনসারুল্লাহ্র আমেলার সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন বিভাগের কায়েদের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল। এছাড়া নায়েব সদর সফে দওম হিসেবেও কাজ করেছেন আর পরবর্তীতে নায়েব সদরও হয়েছেন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তানের সদর হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়েছে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার

মোহতামীম হিসেবেও বিভিন্ন বছরে কাজ করেছেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযিয়ার নায়েব সদরও ছিলেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবে কাজ করেছেন। মীর দাঊদ আহমদ সাহেবের পরে রিভিউ অফ রিলিজিওন্স এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। খিলাফত লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি ছিলেন। বাইতুল হামদ সোসাইটি রাবওয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ফযলে ওমর ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর ছিলেন। অনুরূপভাবে, যতদিন রাবওয়ায় জলসা হয়েছে (সেযুগে) বেশ কয়েক বছর তিনি সেখানে কাজ করার তৌফিক লাভ করেন এবং ডিউটি দেন। তিনি নায়েব অফিসার জলসা সালানা এবং নাযেম মেহনত ছিলেন। নাযেম মেহনতের দায়িত্ব বড় শ্রমসাধ্য কাজ হয়ে থাকে আর এমন শ্রমিকদের সাথে বোঝাপড়া করতে হয় যারা অ-আহমদী। রুটি প্রস্তুতকারক (নানবাঈ) আর আটা (খামির) প্রস্তুতকারকরা অনেকটা বক্র স্বভাবের হয়ে থাকে। তাদেরকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা জলসার অনেক বড় একটি দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি এই দায়িত্ব খুবই সুচারুরূপে পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। 'তাবাররুকাত' কমিটিরও সভাপতি ছিলেন। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার সংকলন সংক্রান্ত রেজিস্টার কমিটিরসদস্য ছিলেন। 'মজলিসে ইফতা'রও সদস্য ছিলেন। 'তারীখে আহমদীয়াত' বা আহমদীয়তের ইতিহাস-সংক্রান্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। খিলাফত কমিটির সদস্য ছিলেন। শিরকাতুল ইসলামিয়ার নিগরান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালকও ছিলেন। নাযারতের পাশাপাশি এ রকম অনেক কমিটির দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত ছিল। ১৯৮৯ সনে তার এবং মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব এবং আঞ্জুমানের আরো দু'জন কর্মীর কুখ্যাত '২৯৮ সি' ধারার অধীনে কয়েকদিন 'রাহে মওলা' (আল্লাহ্ তা'লার পথে বন্দী) এর জীবন কাটানোরও সৌভাগ্য হয়েছে।

২০১০ সনের ২৮ মে লাহোরে যে ঘটনা ঘটেছে, যেখানে অনেক আহমদী শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তখন 'নাযের এ আলা' তাৎক্ষণিকভাবে লাহোর জামা'তকে আশ্বস্ত করার জন্য এবং শহীদ পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ ও রোগীদের দেখাশোনার জন্য যেই প্রতিনিধি দল লাহোর প্রেরণ করেন, তাদের আমীর ছিলেন মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। শহীদদের হাসপাতালে নেয়ার সময়ই তিনি লাহোর পৌঁছে যান এবং পরবর্তী প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। লাহোরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা বা কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান তিনি নিজেই করেন। এই প্রতিনিধি দল 'দারুয যিকর'এ যায় আর গভীর অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে কষ্ট করে সমস্ত দায়িত্ব তারা পালন করেন। ছাড়া আহতদের চিকিৎসার তত্ত্বাবধানও করতে থাকেন আর শহীদদের পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি যান। 'দারুয যিকর'এ সেদিনই তিনি আমেলার মিটিং আহ্বান করেন এবং নতুন আমীর নিযুক্তির ঘোষণাও সেখানেই দেন। মাগরিব ও এশার নামায তিনি সেখানেই পড়ান যাতে মানুষের মনোবল চাঙ্গা থাকে অর্থাৎ এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, ঘটনা ঘটার পর আমরা মসজিদ ছেড়ে চলে যাব বা মসজিদ খালি করে দিব! আর তিনি যখন হাসপাতালে আহতদের

খবরাখবর নিতে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার গভর্ণর সালমান তাসীর সাহেবও সেখানে আসেন এবং সহানুভূতি ও সমবেদনা ব্যক্ত করেন। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব তার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতামূলক বইপুস্তক ছড়ানো হচ্ছে; এটিই এই হামলার কারণ। গভর্ণর হিসেবে এদিকে দৃষ্টি দেয়া আপনার দায়িত্ব। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাদেশিক মন্ত্রী জাভেদ মাইকেল সাহেবও সমবেদনা জানাতে আসেন। এখানেও তিনি বড় বীরত্বের সাথে মন্ত্রী সাহেবকে বলেন, আপনি সমবেদনা জানাতে এসেছেন, এজন্য আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট থাকা উচিত যে, আমরা কিছুতেই নিজেদেরকে সংখ্যালঘু মনে করি না, আমরা মুসলমান। মন্ত্রী মহোদয় তখন বলেন, আমি আসলে মানবাধিকার সংক্রান্ত মন্ত্রীও, আর সেজন্যই আমি এসেছি। তিনি তাকে আরো বলেন, কেবিনেট বা মন্ত্রী পরিষদে আপনার আওয়াজ উত্তোলন করা উচিত যে, আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে যে প্রপাগাণ্ডা চলছে, সরকারের উচিত হবে তা বন্ধ করা। যাহোক, এভাবেই তিনি তাকে তার দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আসলে, আমাদের দৃষ্টি তো সবসময় মহান আল্লাহ্ তা'লার সত্তাতেই নিবদ্ধ থাকে আর তিনিই এ পরিস্থিতি শুধরাবেন এবং পরিবর্তন করবেন, ইনশাআল্লাহ্। ২৯ এবং ৩০ মে তিনি সেখানে সংবাদ সম্মেলনও করেন। আর ২রা জুন তারিখে এক্সপ্রেস নিউজের লাইভ অনুষ্ঠান 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে' রাত ১১টা থেকে ১২টার সম্প্রচারে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া সুইস ন্যাশনাল টিভি, বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, সাহারা টিভি, চ্যানেল ফাইভ এবং দুনিয়া টিভি ইত্যাদিতে তিনি সাক্ষাতকার দেন। যাহোক, এই টীমটি ১২ জুন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে এরপর ফিরে আসে। এসব সাক্ষাৎকারে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাদের বলেছিলেন, 'আমরা মুসলমান'। আর আমাদের মুসলমান হওয়ার অধিকার আমাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর এক খুতবায় নিজের একটি স্বপ্ন শুনিয়েছিলেন। তাতে তিনি তার কথা এভাবে উল্লেখ করেছিলেন, 'আমি ভাবছিলাম যে, আমার নিজের ব্যস্ততা বাড়ানো উচিত। রাতে, স্বপ্নে মিয়াঁ আহমদ সাহেবকে দেখি। অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে দেখি যিনি সবসময় খুবই ভালো পরামর্শ দিয়ে থাকেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, পবিত্র কুরআন সম্পর্কেও তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তফসীরে সগীরের পিছনে নোট লেখার পরিবর্তে আমি যেন স্বয়ং নতুন করে অনুবাদ করি। তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'লা এই অনুবাদ করার তৌফিক দিয়েছেন আর এতে অনেক বিষয়ের সমাধান হয়েছে। এর পর রয়েছে দীর্ঘ স্বপ্ন যাতে উল্লেখ রয়েছে বিয়ে-শাদী এবং ছেলে-মেয়েদের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং এ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে কীরূপ প্রস্তাবাদি হওয়া উচিত। স্বপ্নে, মিয়াঁ আহমদ সাহেবই খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে এটি বলেন, আপনি এ ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন। **(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল এর ১৯ থেকে ২৫ জানুয়ারি, ২০০১ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত)**

এক পত্রে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে লিখেন, স্নেহের আহমদ সাল্লামাহুল্লাহ্! আসসালামু আলাইকুম। আপনার উৎকণ্ঠাপূর্ণ পত্র পেয়েছি। আমি আপনার জন্য

বিনয়াবনত দোয়া করে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রকৃতিতে সত্য এবং পুণ্য রেখেছেন, আর এই দু'বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা কখনো বিনষ্ট করেন না। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিক আধ্যাত্মিক উন্নতি দিন এবং হৃদয়ের প্রশান্তিরূপী জান্নাত প্রদান করুন।

অনুরূপভাবে আরেক পত্রে তিনি বলেন, আমি আপনাকে আমার দোয়ায় স্মরণ রাখি। আর আপনাদের অধিকারও আছে কেননা ধর্মসেবার ক্ষেত্রে আপনারা আমার পরম সাহায্যকারী। আল্লাহ্ তা'লা সবসময় আপনাদের নিরাপদে রাখুন, সুস্বাস্থ্য দিন, নিরাপত্তার মাঝে রাখুন, আর কখনো কোন দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা যেন আপনাকে স্পর্শ করতে না পারে। এরপর লিখেন, আমাকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। আমার পরম বাসনা হলো, মানুষ যেন খুব দ্রুত আহমদীয়াত গ্রহণ করে। পুনরায় বলেন, এমটিএ'র অস্ত্রও সারা পৃথিবীতে কাজ করে চলেছে আর আমার বাসনাকে বাস্তবে রূপায়িত করছে। ভালো ভালো অনুষ্ঠান প্রেরণ করুন যেন সর্বত্র কেবল আলোর রাজত্ব বিরাজ করে। শয়তান ও সীমালঙ্ঘনকারী অপশক্তি যেন রমযানে পুরোপুরি শিকলাবদ্ধ হয়ে যায়।

তার স্ত্রী আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন, প্রত্যেক রাতে তিনি সেখানে গিয়ে ডিউটি দিতেন। এটি বিয়ের পূর্বের কথা। একইভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর যুগেও খিলাফতের সাথে তিনি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হুযূর তার ওপর গভীর আস্থা রাখতেন। ১৯৭৪ সনে বেশ কিছুকাল তিনি এবং মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব উভয়ে অহোরাত্র সেখানে অর্থাৎ কাসরে খিলাফতে অবস্থান করেন। বাড়িতে আসার অনুমতি ছিল না।

বিশেষভাবে ১৯৭৩ এবং '৭৪ সনে, আর পরবর্তীতেও, তিনি যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন তখনও খলীফা সালেস (রাহে.)-এর সাথে কাজ করতেন। দীর্ঘদিন তো বাড়িতেই আসতেন না। এর পূর্বেও সকালে যেতেন আর রাত ১০টার দিকে বাসায় ফিরতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে একটি বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন, আর তা হলো, এক ইজতেমার সময় তিনি যখন অনুরোধ করেন যে, হুযূর আহাদনামা পড়িয়ে দিন, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, তুমি পড়াও। অর্থাৎ সদর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে বলেন, তুমি পড়াও এবং নির্দেশ দিয়ে তার দ্বারা আহাদনামা পড়ান আর হুযূর স্বয়ং অন্যান্য খোদ্দামের মতো তার পিছনে দাঁড়িয়ে আহাদনামা পাঠ করেন। মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর আমি বলেছিলাম যে, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছিলেন, এই দু'ব্যক্তি সব খিলাফতের প্রতিই বিশ্বস্ত আর আমার প্রতিও বিশ্বস্ত। তিনি আমাকে লিখেছিলেন এবং মৌখিকভাবেও বলেছিলেন। তখন যেহেতু তার দ্বিধাদ্বন্দ ছিল তাই নিজের নাম লিখেন নি আর আমিও খুতবায় বলি নি, কেবল মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের কথাই বলেছি। আসলে যুগপৎ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ও মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব উভয় সম্পর্কে খলীফা রাবে (রাহে.) বলেছিলেন, এরা সব খিলাফতের

প্রতিই বিশ্বস্ত আর আমার প্রতিও বিশ্বস্ত। হুযূরের আংটি যখন হারিয়ে গিয়েছিল, তখন তা খুঁজে বের করার জন্য তাদেরকেই অর্থাৎ এই দু'জনকেই তিনি ডাকেন। এছাড়া তিনি বলতেন, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) প্রথমে আমার নাম নিয়েছেন যে, আহমদ এবং খুরশীদ এরা উভয়ে আমার বিশ্বস্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং সব খিলাফতের বিশ্বাসভাজনদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তার স্ত্রী বলেন, তার রাতের নফলে অর্থাৎ তাহাজ্জুদে এতটা আহাজারি বিরাজ করত যে, ঘরে প্রতিধ্বনি অনুরণিত হতো, যাতে তিনি মহানবী (সা.), মসীহ্ মওউদ (আ.), খলীফায়ে ওয়াক্ত, জামা'ত, পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী-সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজন সবার জন্য দোয়া করতেন। তিনি নিজের নফল নামাযে অর্থাৎ তাহাজ্জুদে সূরা ফাতিহার কোন কোন আয়াত বারংবার পুনরাবৃত্ত করতেন। তিনি বলেন, তার নিজের পিতামাতা এবং ভাইবোনের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কখনো ন্যায়কে জলাঞ্জলি দিতেন না। পরিবারের সদস্যদের দিয়ে স্ত্রীকে সম্মান করিয়েছেন আর পরিবারের সদস্যদের সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক সুদৃঢ় করেছেন। অর্থাৎ উভয় সম্পর্কের মাঝে এক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেউ সামান্য উপহার দিলেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। হয় উপহার হিসেবে তাকে ফেরত দিতেন বা ঘরে গিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেন বা পত্র লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যে দায়িত্বই ন্যস্ত করা হতো, যতক্ষণ সেই কাজ সমাধা না করতেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন না। তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন আর স্মৃতি শক্তিও ছিল প্রখর। তার স্ত্রী বলেন, কোন রেওয়ায়েত বা পুরোনো কোন আত্মীয়তার কথা তাকে জিজ্ঞেস করলে তা তার নখদর্পণে থাকত। তিনি বলেন, আমি ভ্রমণ বিলাসি ছিলাম। তাই আর্থিক অবস্থা ভালো হোক বা না হোক, শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকুক বা না থাকুক, সহধর্মীণির অধিকার প্রদানের মানসে অবশ্যই ভ্রমণের জন্য তিনি নিয়ে যেতেন। তার স্ত্রী অর্থাৎ আমার বোন লিখেছেন, আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেবের স্ত্রী বলেন, তিনি অর্থাৎ আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন, তার মায়ের ঘরের দরজায় খুব সুন্দর গোলাপের দু'টো শাখা বড় হচ্ছে, যাতে খুবই সুন্দর ফুল ফুটেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তার স্ত্রী লিখেন, সব আয় থেকে প্রথমে চাঁদা দিতেন এরপর তা থেকে খরচ করা হতো। তার স্ত্রী আমাদের মায়ের পক্ষ থেকে বা পিতার পক্ষ থেকে যে সম্পত্তি পেয়েছেন, প্রথমে এর ওসীয়্যত এবং হিস্যায়ে জায়েদাদের জায়েদাদ অংশ প্রদান করেছেন। আর যা আয় হতো তা থেকেও ওসীয়তের চাঁদা দিয়ে দিতেন এবং আমাকে বলতেন, আমি চাঁদা দিয়ে এসেছি। এভাবে তিনি আমার পুরো সম্পত্তির চাঁদা পরিশোধ করেন আর আমার ওপর কোন বোঝাও পড়ে নি। ছেলে-মেয়েদেরকে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন এবং এর ওসীয়্যতও নিজেই পরিশোধ করেছেন।

অনেকেই আমাকে লিখেছে আর আমি নিজেও দেখতাম, তারা উভয় ভাই সবসময় সেখানে একসাথেই থাকতেন। আমার বোন একথাই লিখেছেন, মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী বলতেন, আহমদ এবং খুরশীদকে যদি কোথাও একসাথে যেতে দেখি তাহলে আমার মনে হতো কোন

জামাতী বিষয় হয়ত দেখা দিয়েছে, যে কারণে তারা একত্রে যাচ্ছেন। সকল সংকটের সময় বীরত্ব এবং সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে কাজ করতেন। আর খিলাফতের আনুগত্য তো ছিলই। এখানে এবারকার জলসায় এসেছিলেন, অনেক দুর্বল ছিলেন। আমি তাকে বললাম, ছড়ি ব্যবহার করা আরম্ভ করুন। এতে তাৎক্ষণিকভাবেই তিনি ছড়ি বা লাঠি ব্যবহার করা আরম্ভ করে দেন এই ধারণায় যে এখন তো নির্দেশ এসে গেছে তাই ছড়ি বা ব্যবহার করতেই হবে।

কয়েক বছর পূর্বে আমি বলেছিলাম, নাযেরগণ বিভিন্ন জামাতে গিয়ে ঘরে ঘরে আমার সালাম পৌঁছে দিন। তখন তার কাঁধে দায়িত্ব পড়ে সিন্ধু প্রদেশের। তার স্ত্রী বলেন, সিন্ধু সফর থেকে যখন ফিরে আসেন, তখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন, এক ঘরের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। ফযলে ওমর হাসপাতালে যখন দেখানো হয় তখন জানা যায় যে, পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর হাঁড় ফেটে গিয়েছে। আর অন্য পায়ের গোড়ালিতেও সামান্য ফ্র্যাকচার ছিল বা ফেটে গিয়েছিল এবং আঘাত পেয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি ব্যাথা পেতেন না। তিনি বলেন, ব্যাথা তো অনুভব হতো কিন্তু যেহেতু খলীফায়ে ওয়াক্তের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিল, তাই এই ১১ দিন উক্ত কষ্ট বা ব্যাথা সম্পর্কে ভাবি নি এবং নিজদায়িত্ব শেষ করে এসেছি। তার বড় পুত্র লিখেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের পর হুযূরের খুতবার ক্যাসেট সর্বপ্রথম তার কাছে আসতো। তিনি বিশেষ গুরুত্বের সাথে সবাইকে সমবেত করে হুযূরের খুতবা শোনাতেন। এমটিএ চালু হওয়ার পরও বিশেষ যত্ন সহকারে খুতবা শোনার ব্যবস্থা নিতেন, ঘরের সবাই যেন খুতবা শোনে, তা নিশ্চিত করতেন। এমনকি ঘরের সেবকবৃন্দ বা বাইরের কর্মচারী যারাই ছিল তাদের খুতবা শোনার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। লাউডস্পিকার লাগিয়েছিলেন, টিভি কিনে দিয়েছিলেন। তিনি যখন লাহোরে যান সেখানকার একটি ঘটনা তার পুত্র লিখেন, রাতে যখন তিনি মিউ হাসপাতালে যান সেখানে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। এম্বুলেন্সের লোকেরা ইচ্ছামত টাকা দাবি করছিল। তখন সেখানে তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া সব ব্যবস্থা করবে। সবাইকে রাবওয়ায় সমাহিত করা হবে এবং সকল মৃতদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ্। কেউ যদি পৈত্রিক বাড়িতে নিয়ে যেতে চায় তাহলে তারও অনুমতি আছে। যাহোক, এর ফলে মানুষের মাঝে অনেকটা স্বস্তি ফিরে আসে। সব আহত লোকদের ঘরে যান। শহীদদের বাসায় যান। তাদের ঘরে খাবারের ব্যবস্থা করান। কোন পরিবারে উপার্জনক্ষম কেউ না থাকলে তাদের জন্য ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। কোন কোন সংবাদ অনুসারে তখন এটি জানা যায় যে, কিছু মানুষ তার পিছনে লেগে আছে আর বিভিন্ন এজেন্সির পক্ষ থেকে অবহিত করা হয় যে, তার জীবনের জন্য হুমকি রয়েছে। তখন তাকে সেখান থেকে ফেরত আসতে বলা হয়। কিন্তু ২৮ মে'র পরবর্তী জুমুআয় তিনি পুনরায় সেখানে যান এবং 'দারুয যিক্‌র'এ গিয়ে তিনি স্বয়ং জুমুআ পড়ান, যেন জামা'তের লোকদেরও মনোবল চাঙ্গা হয়। গরীবদের বিশেষভাবে যত্ন নিতেন। পুরোনো বন্ধুদের দেখাশুনা করতেন। তার শৈশবের একজন

সহপাঠি পড়াশোনা শেষ করতে পারেন নি এবং পরবর্তীতে রঙের কাজ বা বাড়িঘরে পেইন্টিংয়ের কাজ আরম্ভ করেন, তার অনেক খবরাখবর রাখতেন। এমনকি তার ইন্তেকালের পর তার সন্তানসন্ততিরও খবরাখবর রাখেন। ১৯৮৯ সনে তিনি গ্রেফতার হন। এর কারণ ছিল, তখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হচ্ছিল। মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব তখন নাযের উমুরে আমা ছিলেন, তিনি রাবওয়ার বাইরে ছিলেন আর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ডাকে এবং নির্দেশ দেয় যে, ইজতেমা বন্ধ কর। তিনি বলেন, আপনারা আমাদেরকে ইজতেমা করার লিখিত অনুমতি দিয়েছেন। এখন বন্ধ করারও লিখিত নির্দেশ দিন, আমরা বন্ধ করে দিব। ম্যাজিস্ট্রেট বলে, না, মৌখিক নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, বন্ধ কর। তিনি বলেন, মৌখিক নির্দেশে আমরা বন্ধ করব না। যাহোক, সন্ধ্যা বেলা মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবও ফিরে আসেন। তখন তাকেও ডাকা হয়। আর তিনিও একই উত্তর দেন। এর ফলশ্রুতিতে যেমনটি আমি বলেছি, কয়েকদিন বন্দী জীবন কাটান। তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং জেলে দেয়া হয়।

তার মেয়ে বলেন, আমাদের পিতা খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার পুরো চেষ্টা করেছেন আর আমাদেরকেও এই নসীহতই করতেন। তিনি বলেন, একবার আব্বা আমাকে গভীর ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠার সাথে দোয়ার জন্য বলেন। বরং বেশ কয়েক দিন ধরে বলতে থাকেন। আমি জানতাম না যে, কি বিষয় ছিল কিন্তু ধারণা হয় যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে সামান্য অসন্তুষ্টি ছিল, যার ফলে আব্বার নামাযে এত ব্যাকুলতা ও কাকুতিমিনতি বিরাজ করত। আমার মন মস্তিষ্কেও তা প্রভাব বিস্তার করে আর আমার অবস্থাও তেমনই হয়ে যায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের সময়, তার মা সাহেবযাদী সৈয়দা নাসিরা বেগম সাহেবা খুবই অসুস্থ ছিলেন। অবস্থা শোচনীয় ছিল। আর হিজরতের রাতে এমন মনে হচ্ছিল যে, এটি তার মায়ের অন্তিম রাত, কিন্তু তিনি জামা'তী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হিজরত সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাই মায়ের কক্ষেও যান নি, জামা'তী কাজেই ব্যস্ত থাকেন।

অনুরূপভাবে, খিলাফতে খামেসার যুগে, আমার সাথেও সবসময় আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। বরং তার ছেলের প্রশ্নের উত্তরে একথাই বলেন যে, তুমি কী খিলাফতের সত্যতার নিদর্শন দেখতে পাও না যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন কীভাবে খলীফাতুল মসীহ্ খামেসের সাথে বিরাজ করছে। তার এক ছেলে লিখেন, আমাদেরকে নামাযের জন্য জাগাতেন। এ ক্ষেত্রে সচরাচর কিছুটা কঠোর ছিলেন কিন্তু শেষের দিনগুলোতে এত গভীর বেদনাঘন কণ্ঠে জাগাতেন যে, এর ফলে স্নেহ এবং ভালোবাসাই প্রকাশ পেত। তার পুত্র আরো বলেন, তার কাছে এবং তার স্ত্রীর কাছে খলীফাদের যেসব পত্র আসে সেসব চিঠি কপি করে এবং ফাইলবন্দী করে আমাদের হাতে অর্থাৎ সন্তানদের হাতে ন্যস্ত করেন যে,এগুলো আমাদের সারা জীবনের মূলধন। এই চিঠিগুলোকে নিজেদের কাছে রেখো।

মির্যা আনাস আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, তার ইন্তেকালের সময় আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে, ভাই খুরশীদ এবং মিয়াঁ আহমদ আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেছেন আর মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে। তিনি বলেন, তখন স্বপ্নেই আমার হৃদয়ে এই বাসনা জাগে, আল্লাহ্ করুন আমারও যেন এভাবে সাক্ষাৎ লাভ হয়। তাই আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্! আমাকেও তোমার কাছে ডেকে নাও। তখন আল্লাহ্ বলেন, তুমি এগিয়ে আস। তিনি বলেন, মিয়াঁ আহমদের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আর আমরা প্রায় সমবয়সী ছিলাম। তার বিভিন্ন পুণ্য দেখে আমি লজ্জিত হতাম, এমর্মে যে আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাকেও এমন সৌভাগ্য দান করতেন! তিনি বলেন, কোন বিষয়ে আমার সাথে কখনো রাগ করলে সবসময় তিনিই প্রথমে আমাকে ক্ষমা করতেন। অনুরূপভাবে, তার নামাযের সৌন্দর্য সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন, তিনি এরূপ বিগলিতচিত্তে নামায পড়তেন, যা দেখে আমার ঈর্ষা হতো। খুবই বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল ছিলেন। পাঁচবেলার নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া, গরীবদের সাহায্য করা, তাদের কাজে আসা আর নিজ শক্তিসামর্থ্যকে খোদার পথে ব্যয়ের সৌভাগ্য তিনি পেয়েছেন।

চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেবও একথা লিখেছেন যে, তিনি খুবই বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরামর্শ সভায় তার মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। জামা'তের বই-পুস্তক এবং ইতিহাসের সুগভীর জ্ঞান রাখতেন। যখনই সুযোগ আসতো জামা'তের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন। ১৯৭৪ এর অশান্ত যুগে বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের বহির্বিশ্ব সফরে তিনি তাঁর সফরসঙ্গী হন। একবার কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিনিধি হিসেবে হুযূরের সফরসঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

কাদিয়ান থেকে জামাতের কর্মী আকরাম সাহেব লিখেছেন, মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি তার কাছে সমবেদনা জানালে তিনি গভীর বেদনার সাথে আমাকে বলেন, আমার জন্য কাদিয়ানে নিজেও দোয়া কর এবং অন্যান্য বুযুর্গদেরও দোয়া করতে বলো। কেননা মিয়া খুরশীদ সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি নিজেকে খুবই নিঃসঙ্গ অনুভব করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নতুন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। এভাবে তিনি দোয়ার জন্যও বলতেন। যখনই কাদিয়ান সফর করতেন, দরবেশদের বাসায় যেতেন। আর একইভাবে সেখানকার দরবেশদের বিধবাপত্নী এবং এতীমদের সেবা করার চেষ্টা করতেন। পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বা পবিত্র স্থানসমূহের গভীর জ্ঞান ছিল তার। আক্রাম সাহেবই আরো লিখেন, কাদিয়ানে পৌঁছে মসীহ্ মওউদ (আ.) যেখানে দোয়া করতেন,প্রায়শ সেখানে দাঁড়িয়ে নফল পড়তেন। আর আমাকেও নসীহত করতেন যে, আপনারা সৌভাগ্যবান কেননা; এসব পবিত্র স্থান বা জায়গায় আপনারা বসবাস করেন। তাই এখানে অনেক বেশি দোয়া করুন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবে তিনি অনেক কাজ করেছেন। সব জায়গায় খোদ্দামদের কাছে পৌঁছে যেতেন। (মোবাশ্বের) গোন্দল সাহেবও

লিখেছেন যে, একবার সিন্ধুতে সফরে যান। কোন কোন জায়গায় গাড়ি বা বাহনে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই পায়ে হেঁটে জঙ্গল পেরিয়ে খোদ্দামদের কাছে পৌঁছেন। এর ফলে খোদ্দামদের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে আর আজও তারা তা স্মরণ করে।

অনুরূপভাবে, ইতিহাস বিভাগের প্রধান আসফান্দ ইয়ার মুনীব সাহেব লিখেছেন, আহমদীয়াতের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তিনি এক বিশেষ কল্যাণকর ব্যক্তি ছিলেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি দেখতেন আর খুবই মূল্যবান এবং নির্ভরযোগ্য প্রস্তাবাদি দিতেন আর দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। জামা'তের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পটভূমি এবং এর প্রতিটি অনুষঙ্গ ও ঘটনার প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। এডিশনাল নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ ও তা'লীমুল কুরআন মির্যা মোহাম্মদ দ্বীন নায সাহেব বলেন, নাযেরে আলা হিসেবে নিযুক্তি লাভের পর আমি যখন তার কক্ষে যাই তখন তিনি নাযের এ আলা'র চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার অবস্থা দেখার মতো ছিল। তার চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত, আর চেহারায় ছিল গভীর দোয়ায় নিমগ্নতার ছাপ আর ভাবাবেগে বিভোর; অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তিনি আমাকেও দোয়ার অনুরোধ করেন।

যাহেদ কুরায়শী সাহেব বলেন, তিনি যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন, খোদ্দামুল আহমদীয়া লাহোরের কায়েদ আমাকে একটি কাজের জন্য তার কাছে পাঠান। আমি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এওয়ানে মাহমুদে তার অফিসে যাই এবং কাগজ-পত্র তার হাতে সোপর্দ করি। এটি হলো গ্রীস্মের এক দুপুরের কথা। কাগজ-পত্র নেয়ার পর তিনি জিজ্ঞেস করেন, খাবার খেয়েছেন কী? আমি বললাম, কাজ শেষ করে দারুয্ যিয়াফতে গিয়ে খাবার খাব। তিনি বলেন, না, আমার সাথে চল। কিছুক্ষণ বস। এখনই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম, হয়ত এওয়ানে মাহমুদেই খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বাইরে আসেন, সাইকেল বের করেন আর বলেন, আমার পিছনে বস। তিনি বলেন, যাহোক আমরা যাত্রা করি। পথিমধ্যে আমি বলি, আমি দারুয্ যিয়াফতে চলে যাই, রাস্তায় দারুয্ যিয়াফত পড়বে। তিনি বলেন, না, পিছনে বসে থাক। এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তিনি সাইকেলের পিছনে বসিয়ে আমাকে বাসায় নিয়ে যান এবং সেখানে খাবার খাইয়ে তারপর আমাকে বিদায় দেন। সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া থাকাকালে সব খাদেমের সাথে তার ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল।

অনুরূপভাবে অনেকেই লিখেছেন, আমরা তার কাছে অনেক কাজের রীতি-পদ্ধতি শিখেছি। ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব লিখেছেন, কাজের অনেক নিয়ম ও পদ্ধতি তার কাছে শিখেছি। বিষয়ের গভীরে অবগাহন করে কাজ করার অভ্যাস ছিল তার। ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব আরো লিখেছেন, ৮৪'র অর্ডিন্যান্সের পর কেন্দ্রীয় শরীয়া আদালতে যে আপিল করা হয় তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন মিয়াঁ আহমদ সাহেব। তিনি বলেন, আমার মনে আছে একদিন হঠাৎ মিয়াঁ সাহেব স্বয়ং এওয়ানে মাহমুদে আসেন যেখানে আমি ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম আর বলেন,

লাহোর আদালতে বই পুস্তকের প্রয়োজন। যা এখানকার লাইব্রেরী থেকে নিয়ে যেতে হবে আর সেখানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনার। যেসব বই-পুস্তকের প্রয়োজন হতো তা লাহোর থেকে ফোনে লিখিয়ে দেয়া হতো। এরপর তিনি লাইব্রেরীর কর্মচারীদের সাথে এসে স্বয়ং পরিশ্রম এবং চেষ্টা করে বই-পুস্তক বের করাতেন। এমনটি নয় যে, বলেই চলে যাবেন, বরং স্বয়ং উপস্থিত থেকে কাজ করানোর অভ্যাস ছিল তার। এতীম ও বিধবাদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আজই আমার কাছে হাসপাতালের আউটডোরে রাবওয়াবাসী এক ভদ্রমহিলা বুশরা সাহেবা আসেন, তিনি ছিলেন বহুমূত্র ও উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত রোগী। তার রিপোর্ট দেখে আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কৃপায় আপনার পরীক্ষার ফলাফল এখন নরমাল এসেছে। একথা শুনে, তিনি কেঁদে ফেলেন। আমি আশ্চর্যের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে, তিনি কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব! আমার ডায়বেটিস তো ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু বিনামূল্যে যারা আমার চিকিৎসা করাতেন তাদের দু'জনই অর্থাৎ মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব এবং মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব উভয়ে এ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। তিনি বলেন, আমি তাকে আশ্বস্ত করি যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে আপনার চিকিৎসা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু তিনি তাদের স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন।

লন্ডনের ফযল মসজিদের ইমাম আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব বলেন, ১৯৭৩ সনের শেষের দিকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিসে শূরার পরামর্শের পর আমাকে যখন কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত করেন তখন মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব নায়েব সদর ছিলেন। তার ব্যাপক অভিজ্ঞতার কারণে আমি আমেলায় নায়েব সদর হিসেবে তার নাম প্রস্তাব করি। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং পদমর্যাদার দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু যখন তাকে নায়েব সদর নিযুক্ত করা হয়, আতাউল মুজীব সাহেব বলেন, তিনি পরম বিনয়ের সাথে সবকাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। আর কোন ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র এটি প্রকাশ পেতে দেন নি যে, তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়।

মালয়েশিয়া থেকে শাহেদ আব্বাস সাহেব লিখেন, আমি ২০০৫ সনে বয়আত করি আর জামাতের কেন্দ্র দর্শনে যাই। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব অফিসে আসছিলেন। আমার সাথী মুয়াল্লিম দানিয়েল সাহেব আমাকে বলেন, ইনি খলীফায়ে ওয়াক্তের নিকটাত্মীয়, তাকে দোয়ার জন্য অনুরোধ করুন। তিনি বলেন, আমি তার কাছে যাই এবং বলি, আমি শিয়া ফিরকা থেকে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হয়েছি,আমার জন্য দোয়া করবেন। তিনি আমার সাথে কোলাকুলি করেন এবং দৃঢ়ভাবে আমার হাত ধরে গভীর আবেগ ও উচ্ছাসের সাথে বলেন, আমি আপনাকে এমন এক সত্তার কথা কেন অবহিত করবো না, যার কাছে আমি নিজেই দোয়ার জন্য অনুরোধ করি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? তিনি বলেন, যুগ-খলীফা এবং আরো বলেন, যুগ খলীফাকে দোয়ার জন্য লিখতে থাকুন। এই নতুন বয়আতকারী বলেন, আমি তার চোখে খলীফায়ে ওয়াক্তের জন্য যে

ভালোবাসা এবং আন্তরিক অনুরাগ প্রত্যক্ষ করেছি, তা ছিল দেখার মত। আর সেই মুহূর্তগুলো আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

আরবী ডেস্কে-নিযুক্ত মুরব্বী আঞ্জুম পারভেজ সাহেব লিখেন, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেব বলেছেন, একদিন দুপুরবেলা প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে সাইকেলে চেপে মিয়াঁ আহমদ সাহেব এক ব্যক্তিকে খুঁজছিলেন, যে রং মিস্ত্রীর কাজ করতো। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এত গরমের মধ্যে আপনি কাকে খুঁজছেন। তিনি বলেন, একজনকে আমি ভুল হোমিও ঔষধ দিয়ে দিয়েছি আর এখন তাকে খুঁজছি যেন সঠিক ঔষধ তাকে পৌঁছে দিতে পারি সে কোথাও ভুল ঔষধ না খেয়ে ফেলে। তাই আমি নিজে তাকে খুঁজে এই ঔষধ পৌঁছানোর চেষ্টা করছি কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনুরূপভাবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ওপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং সমাধা করতেন। মানুষ অনেক ঘটনা লিখেছে। অফিসে যারাই তার সহকর্মী ছিল তারা বলেন, খুবই কোমলতা, স্নেহ এবং ভালোবাসার সাথে কাজ করাতেন। দুঃখী এবং সমস্যাকবলিত মানুষ ও অভাবীদের প্রতি যথাসাধ্য সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতেন। খুবই বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। খোদাপ্রদত্ত এমন দক্ষতা ছিল যে, নিমিষে বিষয়ের গভীরে অবগাহন করতেন। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, তাৎক্ষণিকভাবে কাজ সমাপ্ত করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

একইভাবে একবার তার অফিসে কিছু ছেলে আসে। এটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেকার কথা। কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত কিছু কর্মী তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে, মারধর করেছে বা কঠোর ব্যবহার করেছে, তারা সেই অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। তাদের একজন অনেক আঘাতও পেয়েছিল। এতে তিনি তাকে বলেন, তুমি হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়েছ কী? সে বলে, না দেখাই নি। তিনি বলেন, প্রথমে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাও। আজকে অফিস ছুটি, অফিস খুললে আমি ইনশাআল্লাহ্ সব ব্যবস্থা নিব। আর যে-ই দোষী সাব্যস্ত হবে, তা সে কর্মকর্তা হোক বা যে-ই হোক না কেন, সে শাস্তি পাবে। আর তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেন এবং সেসব ছেলেকে হাসপাতালে পাঠান আর বলেন, প্রথমে নিজেদের চিকিৎসা করাও।

ইকবাল বশীর সাহেব দেওয়ান অফিসে কর্মরত। তিনি বলেন, যখন মিয়াঁ আহমদ সাহেবকে নাযের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয় তখন অফিসে কর্মী সংখ্যা কম ছিল। শুধু দু'জন করণিক এবং একজন সাহায্যকারী ছিল। কাজের চাপ যখন বেড়ে যেত, তখন প্রায়শ এটিই হত যে, মিয়াঁ আহমদ সাহেব আমাদের সাথে এসে বসে পড়তেন আর চিঠিপত্র প্রেরণ এবং গ্রহণের কাজে আমাদের সাহায্য করতেন।

একজন অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী রিয়াজ মাহমুদ বাজওয়া সাহেব বলেন, একদিন আমি অফিসে বসেছিলাম। আলোচনাকালে মিয়াঁ সাহেবের বাচনভঙ্গিতে কিছুটা কঠোরতা প্রকাশ পায়। সচরাচর এমনটি হতেই পারে। এতে আমার মনে কোন দুঃখ ছিল না আর আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। আমি

ঘরে ফিরে যাই। সন্ধ্যাকালে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে দেখি, মিয়াঁ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে আশ্চর্য হই। তিনি বলেন, আজকে অফিসে আপনার সাথে রুক্ষস্বরে কথা বলেছি। তাই আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। তিনি বলেন, আমি তার এমন আচরণের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। তখন থেকে আমার হৃদয়ে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মে। অনুরূপভাবে, আরেকজন সাহায্যকারী কর্মী ও একজন সাধারণ কর্মীও একই কথা লিখেছেন, প্রথমে আমাকে বকা দিয়েছেন এবং পরে ক্ষমা চেয়েছেন। অনুরূপভাবে আরো একটি ঘটনা কেউ লিখেছেন যে, অফিসে আমার পক্ষ থেকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হলে তিনি সতর্ক করেন। ঘরে বসে ইস্তেগফার করছিলাম এমন সময় দরজার কড়া নড়ে ওঠে। আমি বাইরে গিয়ে দেখি, মিয়াঁ আহমদ সাহেব দাঁড়িয়ে। তিনি বলেন, আজকে আমি তোমাকে শক্ত ভাষায় কিছু বলেছি, তাই ক্ষমা চাচ্ছি। এরপর গাড়িতে উঠে বসেন আর ফিরে যান।

মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব বলেন, আমি 'খালিদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। মরহুম মাহমুদ বাঙ্গালী সাহেব অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন। তার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়, তাতে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, মিয়াঁ আহমদ সাহেব যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন তখন তিনি তরবিয়তী ক্লাসের নাযেমে আলা ছিলেন। ক্লাস শেষে খরচের যে বিল তিনি জমা দেন তাতে নির্ধারিত বাজেটের বাইরে বাড়তি কয়েক আনা খরচ হয়ে যায়। কয়েক আন অর্থাৎ কয়েক পয়সা মাত্র। সদর সাহেবের পক্ষ থেকে বিল প্রত্যাখ্যাত হয়। সদর সাহেব বলেন, এটি পাশ করা যেতে পারে না। তিনি বলেন, আমি নিজে তার কাছে যাই এবং বলি, এটি তো বড় কোন বিষয় নয়, কয়েক আনাই অতিরিক্ত খরচ হয়েছে আর এটি বড় কোন অঙ্কও নয়। আপনি যদি না দেন তাহলে আমি আমার পকেট থেকেই খরচ করছি। তিনি বলেন, নিজের পকেট থেকে খরচ করার বিষয় নয়। আসল বিষয় হলো, আমি আপনাদেরকে এটি বুঝাতে চাই যে, জামাতের অর্থ-সম্পদ খরচের ক্ষেত্রে সাবধান থাকা উচিত। আর জামা'তী নিয়ম-কানুন অর্থাৎ যেই নিযাম বা ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা অনুসরণ করা উচিত। প্রয়োজন বেশি থাকলে পূর্বেই মঞ্জুরী নিয়ে, এরপর খরচ করা উচিত ছিল। তিনি বলেন, বাঙ্গালী সাহেব বলতেন, তার এভাবে শক্ত হাতে ধরা আমার পরবর্তী জীবনে অনেক কাজে আসে। তিনি বলেন, খিলাফতের সাথেও তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। একবার ইফতা কমিটিতে যাকাতের কোন বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছিল। ইফতা একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিল। আমার মনে হয় ঘোড়ার ওপর প্রদেয় যাকাত বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছিল। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি এবং বলি, এটি পুনরায় খতিয়ে দেখুন, এ সম্পর্কে ইজতেহাদের প্রয়োজন রয়েছে। বেশ কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। আর প্রত্যেকবার আলেমদের দীর্ঘ বিতর্ক হতো কিন্তু তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতো না। অবশেষে, সদর সাহেব তাকে সেই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করেন। সেখানেও আলেমরা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল, অর্থাৎ আমি যে কথা বলেছিলাম তা উল্টে দেয়া ছিল উদ্দেশ্য। প্রথমে তিনি কিছুক্ষণ তাদের কথা শোনেন। মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব বলেন, এরপর তিনি গুরুগম্ভীর প্রতাপান্বিত

কণ্ঠে বলেন, যুগ-খলীফা যেখানে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন সেখানে আমরা কেন ভাবছি যে, এর বিপরীত কিছু হতে পারে, সব যুক্তি-প্রমাণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এটি দেখেন নি যে, কে বড় আলেম বা কে কী বলছে। তিনি বলেন, আহমদীয়াতের ইতিহাস এবং জামা'তী ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি যেন বিশ্বকোষ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আজকাল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী লিখছি। কোন জায়গায় সমস্যা দেখা দিলে তার কাছে যেতাম। এ সম্পর্কে তার খুবই নির্ভরযোগ্য এবং বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ছিল। অনুরূপভাবে কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ সম্পর্কেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। কেউ যদি তাকে বলতো যে, কাদিয়ানের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো আমাদের দেখান এবং পরিচয় করিয়ে দিন, তিনি সানন্দে তা করতেন। একবার তিনি অসুস্থ ছিলেন, পা মচকে গিয়েছিল, কিন্তু তাসত্ত্বেও কাউকে বুঝতে দেন নি বরং সাথে নিয়ে ঘুরতে থাকেন। মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব বলেন, সিঁড়িতে ওঠার সময় আমরা বুঝতে পেরেছি, বরং তিনি নিজেই বলেন, আমার এই সমস্যা আছে। তখন আমরা লজ্জিত হই যে, কেন আমরা তাকে কষ্ট দিলাম।

অনুরূপ বিষয় আরো অনেক রয়েছে। যখনই জামা'তী কাজে তাকে কোথাও পাঠানো হয়েছে তিনি এটি দেখেন নি যে, পথে কী সমস্যা আছে বা কী কষ্ট হতে পারে। একবার কোন জামা'তী বিষয়ে দু'পক্ষের মাঝে বিবাদ দেখা দিলে তাদের মাঝে মিমাংসা করানোর জন্য তাকে পাঠানো হয়। রাস্তা খুবই খারাপ ছিল। গাড়ি সামনে যাওয়া সম্ভব ছিল না তাই মির্যা খুরশীদ আহমদ এবং মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব উভয়েই ট্র্যাক্টর বা ট্রলিতে বসেন এবং মুরব্বীদেরও সাথে বসান আর অগ্রসর হন। পথিমধ্যে এমন এক জায়গা আসে, সেখান দিয়ে ট্রলি অতিক্রম করাও বিপজ্জনক ছিল। তাই তারা সেখানে নেমে যান এবং পায়ে হেঁটে অগ্রসর হন। অবশেষে সেখানে বা সেই গ্রামে পৌঁছে তাদেরকে অর্থাৎ বিবদমান পক্ষকে মসজিদে ডেকে রায় প্রদান করেন। তারা দোয়াও করেন, সেখানকার লোকদেরও চৈতন্যবোধ জাগ্রত হয়ে থাকবে যে, এত দূর থেকে এতটা কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে তারা এসেছেন। অতএব, বছরের পর বছর, তাদের মাঝে যে বিষয় নিয়ে বিবাদ ছিল, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাদের কুরবানী এবং তাদের দোয়ার ফলশ্রুতিতে এর সমাধান হয়।

আরো অনেক ঘটনাই রয়েছে। কিছু ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ, কিছু নতুন। কিন্তু তা শোনানোর মত এত সময় এখন নেই। সবাই লিখেছেন যে, কর্মীদের প্রতি অনেক বেশি স্নেহসূলভ ব্যবহার করতেন। তাদের ছোট ছোট চাহিদা বা প্রয়োজনের প্রতিও দৃষ্টি রাখতেন। এরপর তিনি লিখেন (অর্থাৎ মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব) যে, যখন তিনি নায়েব নাযের তা'লীম ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে যুগ খলীফার পক্ষ থেকে কোন ছাত্রের বৃত্তি মঞ্জুর না হলে তখন তিনি বলতেন, বৃত্তি মঞ্জুর হওয়া বা অন্য কোন খুশির সংবাদ হলে তা যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে দিবেন আর যদি অসন্তুষ্টি এবং প্রত্যাখ্যানের সংবাদ হয় তাহলে তা আমাদের পক্ষ থেকে প্রদান করা উচিত।

মুরব্বী সিলসিলাহ্ জাফর আহমদ, জাফর সাহেবও পায়ের হাঁড়ে ফাটল বা চিড় ধরার একই ঘটনা লিখেছেন। তিনি বলেন আমরাও সাথে ছিলাম, পা ফুলে যায় কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করেন নি। সেলিম

সাহেবও লিখছেন যে, যখন তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন তখন ডাক বা চিঠিপত্র বেশি জমে গেলে তিনি বলতেন, সব স্টাফ নিজেদের ডাক এক জায়গায় একত্রিত করে এরপর সবার মাঝে বিতরণ কর। আর বিতরণকালে তিনি নিজেও ডাকের একটি অংশ নিতেন। তিনি বলেন, কর্মচারীদের চেয়ে বেশি ডাক প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে তিনি নিজে নিতেন এবং উত্তর দিয়ে আমাদের পূর্বেই কাজ শেষ করতেন। চিঠি লেখার ক্ষেত্রে ড্রাফটিংয়েও তার ভালো দক্ষতা ছিল এবং তার হাতের লেখাও খুবই সুন্দর, সুদৃঢ় ও উন্নত মানের ছিল। আমি যেমনটি বলেছি, ড্রাফটিং খুবই উন্নতমানের ছিল।

ওকালত মাল সানী-র একজন কর্মী লিখেছেন, আমরা তাহরীকে জাদীদের ইতিহাস লিখছিলাম। আর **'আর্থিক কুরবানীর পরিচিতি '** শিরোনামে আমরা লিখছিলাম। বেশ কিছু ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। চূড়ান্ত ড্রাফট করার পর ওকীলুল মাল সাহেব যিনি ছিলেন তিনি বলেন, মিয়া আহমদ সাহেবকে ফাইনাল কপি দিয়ে আস, তিনি পড়ে দেখুন যে, কোথাও কোন ত্রুটি রয়ে যায় নি তো। তিনি বলেন, আমি বললাম, ঠিক আছে, মিয়া আহমদ সাহেবকে দেই; একশ' পঞ্চাশ থেকে দু'শ পৃষ্ঠা। এত বড় কাজ ছিল, ভাবলাম চার পাঁচ দিন তো আমরা নিশ্চিন্ত থাকব। কিন্তু তিনি বলেন, সকালে আমি অফিসে এসে দেখি সেই খাম পড়ে আছে আর তাতে বিভিন্ন সংশোধনীও ছিল আর তা চিহ্নিতও করা ছিল। রাতারাতি পড়ে, সকালেই তিনি তা সেখানে পৌঁছে দেন। অতএব, এই ছিল তার কাজের দক্ষতা, যা প্রত্যেক কর্মীর জন্য একটি আদর্শ।

তিনি সদর মজলিস কারপরদায ছিলেন। সেখানেও গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিষয়য়াদি খতিয়ে দেখতেন। সামীউল্লাহ্ যাহেদ সাহেব লিখেন, তিনি যখন নাযের ইসলাহ্ ইরশাদ মোকামী ছিলেন, একদিন তিনি আমাকে বলেন, এখানে যত মুরব্বীর পরিবার আছে তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। আমি তাকে তালিকা দিলে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যান এবং তাদেরকে বলেন, তোমাদের স্বামীরা কর্মক্ষেত্রে রয়েছে, তাই তোমাদের কোন সমস্যা থাকলে বা কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাদেরকে বিরক্ত বা চিন্তিত না করে তোমরা আমার কাছে এসে বলবে।

ওকালত তা'মীল ও তনফীয এর কর্মচারী ফরিদুর রহমান সাহেব লিখেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবের বই আমি কম্পোজ করি আর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি দেখানোর জন্য চৌধুরী সাহেব আমাকে তার কাছে পাঠান। তার কাছে পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করার পর আমি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়ালে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোন সমস্যা আছে কী? আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আমার মায়ের অপারেশন। আমি কেবল এতটুকু বলতেই তিনি বলেন, কত টাকা প্রয়োজন? এবং নিজের ড্রয়ার থেকে খাযানার চেকবুক বের করে টেবিলে রাখেন। আমি বললাম, আমার সাত হাজার রুপি প্রয়োজন রয়েছে,তা আমাকে দিন। আর আমার বিল আসলে তা থেকে কেটে নিবেন। কিন্তু তিনি তার ব্যক্তিগত একাউন্ট থেকে আমাকে চেক দেন এবং বলেন, আমি দোয়াও করব। তোমার এটি নিয়ে ভাবতে হবে না যে, বিল আসলে পয়সা কেটে রাখব কী রাখব না। তুমি এই টাকা নিয়ে যাও।

যদি আরো টাকার প্রয়োজন হয় আমার কাছে চলে এস, ভয় পেয়ো না। একইভাবে হাফেয সাহেবও লিখেছেন যে, খিলাফতের সাথে তার একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল আর প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পেত। তাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করা হলে আঞ্জুমানের মিটিংয়ে নাযেরদের সামনে প্রথম কথা তিনি যা বলেন তা হল, আমাকে সাহায্য বা সহযোগিতা করার কথা বলার প্রয়োজন নেই কেননা; যেহেতু খলীফাতুল মসীহ্ আমাকে নিযুক্ত করেছেন তাই আপনারা জামা'তের কর্মীরা তো তা করবেনই। কিন্তু আপনাদের দোয়ার আমার একান্ত প্রয়োজন কেননা, কোন কোন ব্যক্তিবর্গের চরণে ঠাঁই পাওয়া খুব কঠিন হয়ে থাকে। একইভাবে নাযারতে দিওয়ান থেকে পরিবর্তন করে যখন তাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করা হয়, এক কর্মী লিখেন যে, অফিসে যাওয়ার পূর্বে তিনি নাযারতে দিওয়ানের অফিসে আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন এবং বলেন, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। একথা শুনে আমরা আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। আমরা বলি, মিয়াঁ সাহেব! আপনি এখানেই থেকে যান নতুবা আমাদেরও সাথে নিয়ে যান। এতে তিনি মুচকি হেসে বলেন, আমি কীভাবে সাথে নিয়ে যেতে পারি, আমি তো নিজেই খলীফাতুল মসীহ্‌র নির্দেশে যাচ্ছি। এখান থেকে যাওয়ার কয়েক দিন পরই প্রভুর নির্দেশে তাঁর কাছে চলে যান। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তিনি সেখানে পৌঁছে গেছেন যেখানে সবাই নিজ নিজ পালায় যাবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান তারা, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজেদের জীবন কাটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং সেই পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। সব ওয়াকফে যিন্দেগী এবং পদধারীদের উচিত, যেভাবে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াক্‌ফ এর দায়িত্ব এবং নিজের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন সেই পথ অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'লা অন্যদেরকেও সেই সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এই তৌফিক দিন এবং জামা'তকে ভবিষ্যতেও পুণ্যবান, নেক এবং আত্মত্যাগের চেতনা ও বিশ্বস্ততার প্রেরণায় সমৃদ্ধ কর্মী দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযার নামায যা আজকে আমি পড়াব তা হলো, শ্রদ্ধেয়া দিপানু ফরখ হুদ সাহেবার। তিনি গত ২৬ জানুয়ারি ৪৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্ত্রে ইনফেকশনের কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। অপারেশন হয়েছিল কিন্তু এক সপ্তাহ পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। ১৫ বছর বয়সেই তার উভয় কিডনি অকেজো হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং সময়মত নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদে যত্নবান ছিলেন এবং নিয়মিত পবিত্র কুরআনও তিলাওয়াত করতেন, অথচ তিনি খ্রিষ্টধর্ম থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ২০০৪ সনে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর নামায, তিলাওয়াত ও তাহাজ্জুদে নিয়মিত ছিলেন। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এরপর আহমদী মুসলমান হন। তিনি এটি অনুভব করতেন যে, মুসলমানদের মাঝে এখন কোন ত্রুটি রয়েছে। অতএব, মহানবী (সা.)-এর শেষযুগ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে

তিনি সত্য সন্ধানে লেগে যান আর এ কারণে পরবর্তিতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে নিজেকে অগ্রসরমান অনুভব করছিলাম। এমনকি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তার ডাক্তার, যিনি অমুসলমান ছিলেন তিনি বলেন, যখন থেকে তিনি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পেয়েছেন তার হৃদয় নতুন করে শ্বাস নিতে আরম্ভ করে। ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তার হেপাটাইটিস সি-ও হয়ে যায় কিন্তু বয়আতের পর আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিদর্শনমূলকভাবে আরোগ্য দান করেন। তার এই নিদর্শনমূলক আরোগ্যের কথা নিজ পরিবারের লোকদেরকে তিনি প্রায়শ শোনাতেন। আমার সাথে দু'বার তার সাক্ষাৎ হয়েছে। সবসময় অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করতেন। আমীর সাহেব বলেন, কয়েক মাস পূর্বে আমি তার সাথে দেখা করতে যাই। তখন তিনি খাবার প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আমি বললাম, এই কষ্ট করার কী প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন, আপনি প্রথমবার আমার বাসায় এসেছেন আর যুগ-খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন। তার ঘরে সবসময় এমটিএ চালু থাকতো।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ ব্যবহার করুন। তার পরিবারও যেন আহমদী মুসলমান হোক এটিই ছির তার সর্বাত্মক ইচ্ছা এবং বাসনা, আল্লাহ্ তা'লা তার সেই বাসনা এবং দোয়া গ্রহণ করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২-৮ মার্চ ২০১৮, খণ্ডঃ ২৫, সংখ্যাঃ ৯, পৃঃ ৫-১০)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)